কোভিড-১৯ ও উৎপাদনশীলতা: সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

মো: আবদুল জলিল

উৎপাদন আর উৎপাদনশীলতা বিষয় দু'টির পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সমাজে এখনও ধারণা পরিষ্কার নয়। আমজনতা উৎপাদন বাড়ানো মানেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো- এমন ধারণায় বিশ্বাস করেন। এমনকি যারা উৎপাদনশীলতা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করেন, তাদের বাইরে অন্যদের মধ্যেও বিষয় দু'টির মৌলিক পার্থক্য এখনো তেমন স্বচ্ছ নয়। এর কারণ উৎপাদনশীলতা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন কিংবা প্র্যাকটিস আমাদের দেশে খুব বেশি দিনের নয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ০২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। এ বছর উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা' প্রতিপাদ্যটি আমাদের দেশের জন্য সময়োপযোগী হয়েছে।

অর্থনীতিতে সাধারণভাবে উৎপাদনের চারটি উপকরণ বা ফ্যাক্টর যেমন- ভূমি (land), শ্রমিক (labour), পুঁজি (capital) ও সংগঠন/উদ্যোক্তা (organisation/ entrepreneurship) সম্পর্কে আমরা কমবেশি সকলেই অবহিত। এ চারটি উপকরণ ব্যবহার করে শিল্প-কারখানায় পণ্য উৎপাদিত হয়। সেবাখাতেও এই চারটি উপকরণের সংমিশ্রণ থাকে। প্রচলিত অর্থে এই চারটি উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদন বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় বলে সাধারণ মানুষ মনে করেন। কিন্তু উৎপাদনশীলতা ধারণাটি আরও বিস্তৃত ও গভীর।

সন্দেহ নেই , উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির একটি যোগসূত্র রয়েছে। সাদামাটাভাবে বললে , একই পরিমাণ শ্রমিক, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সময় ব্যবহার করে কোনো কারখানায় যদি আগের চেয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় , তাহলে উৎপাদনশীলতা বেড়ে ছে বলে ধরে নেয়া হবে। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণ (Factors of production) যেমন: শ্রমিক, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সময় ইত্যাদি বৃদ্ধি করে কারখানায় উৎপাদন বাড়ালে , উৎপাদনশীলতা বাড়বে না। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ বা ফ্যাক্টরের দক্ষ ব্যবহার , কাঁচামাল ও সময়ের অপচয় রোধ , শ্রমিক বা মানবসম্পদের দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও আগ্রহ , ঝুঁকিমুক্ত উৎপাদনবান্ধব পরিবেশ এবং উন্নত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি জড়িত। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে এর সাথে যোগ হয়েছে পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার , রোবটিক টেকনোল জি, ন্যানো টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সসহ নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ।

উৎপাদনশীলতা বিষয়টি মূলত ব্যবস্থাপনার ধারণা (Management Concept) থেকে উৎসারিত। এজন্যই যেসব প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে, সেগুলোর ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা নিজেদের পারফরমেন্সের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার সূচক উর্ধ্বমুখী রাখতে প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তার নিজস্ব উৎপাদনশীলতার গতি উর্ধ্বমুখী হলে এর প্রভাব অধীনস্থ শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যে জাপানের যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তা গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক দেশকে উজ্জীবিত করেছে। জাপানের আদলে বাংলাদেশেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ জোরদার করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা আন্দোলন বেগবান করার প্রয়াস চলছে। উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে জাপানের কারিগরি সহায়তায় এনপিও দশ বছর মেয়াদী ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করেছে। এনপিও'র প্রচেষ্টায় ১৯৯৫-২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা ৩ দশমিক ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। এক্ষেত্রে এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এপিও) সদস্যভুক্ত এশিয়ার ২০টি দেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৫ শতাংশ। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বার্ষিক গড় উৎপাদনশীলতা ৫ দশমিক ৬ শতাংশ হারে বাড়ানো হবে। এর মধ্যে কৃষিখাতে গড়ে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, শিল্পখাতে ৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং সেবাখাতে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে।

গোটা বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাবে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় এখন ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। শিল্প কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম বা Labour এর জায়গায় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি (Technology), মানবীয় দক্ষতা (Human skills), শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education and training), নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable energy) ব্যবহার ইত্যাদি স্থান করে নিচ্ছে। একসময়ের উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রেনারশিপ কনসেপ্ট এখন ক্রমেই উদ্ভাবক (Innovators) বা সৃজনশীল উদ্ভাবনে রূপান্তর ঘটছে। এগুলোকে মানবীয় পুঁজি (Human capital), এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক পুঁজি (Social capital) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মানবীয় শ্রম বা Human labour ব্যবহার করে আগে যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হতো, আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতির কল্যাণে সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ তরুণ। এদেশের তরুণ সম্প্রদায় অত্যন্ত পরিশ্রমী, সৃজনশীল ও প্রযুক্তিমনস্ক। এখানে বিনিয়োগের ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করছে। রয়েছে অভ্যন্তরীণ বিশাল ভোক্তাগোষ্ঠী। করোনার ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনীতির দূরবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যেখানে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ ৫.২৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই অর্জন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জিডিপি এবং বৈশ্বিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। পাশাপাশি জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়ে ২০৬৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। বর্তমানে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজার, বিপুল ক্রেতাগোষ্ঠী, তরুণ ও সৃজনশীল শ্রমশক্তি, বন্দর সুবিধা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শক্তিশালী কানেক্টিভিটি বিদেশি বিনিয়োগের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মিরাকল। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

শিল্পখাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয় ৫০টিরও বেশি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও পণ্য বৈচিত্রকরণের কাজ চলছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির সুযোগও জোরদার হবে। এছাড়া, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারিদের জন্য ১০০টি ইকোনোমিক জোন গড়ে তুলছে। এর মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের টার্গেট রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক শিল্পখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করা হবে। যেখানে ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

শিল্প সম্ভাবনার বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি 'অনাবিষ্কৃত রত্ন' (Unexplored gem) বলে মনে করা হয়। ইতোমধ্যে এদেশে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা ও রিসাইক্লিং, ওষুধ, চামড়া, সিরামিক, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল, আইসিটি, টেলিযোগাযোগসহ বেশ কিছু শিল্পের প্রসার ঘটেছে। বৈশ্বিক এবং দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সফটওয়্যার নির্মাণ থেকে শুরু করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, মহাকাশ গবেষণাসহ উদীয়মান খাতগুলোতে বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। বাংলাদেশ এখন বিশাল সমুদ্র সীমার অধিকারী, যার মধ্যে রয়েছে মৎস্য, সামুদ্রিক খাদ্য, তেল, গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভান্ডার। সমুদ্র সম্পদকেন্দ্রিক ব্লু-ইকোনোমি বা সুনীল অর্থনীতি সম্প্রসারণের সুযোগ এখন হাতের মুঠোয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজার, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রচুর শ্রমশক্তি এ সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করছে। শিল্প কারখানা স্থানান্তরের সুযোগ কাজে লাগাতে সরকার বিনিয়োগনীতি উদার করেছে। এতে করে আগামী দিনে এদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতগুলোতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আরও বাড়বে। শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে অনেক শ্রমঘন শিল্প কারখানা স্থানান্তরিত হবে। সব মিলিয়ে করোনা মহামারি আপাতত: বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ হলেও এটি শাপেবর হতে চলেছে। এটি সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছে। শিল্প স্থানান্তর আর বিদেশি বিনিয়োগের অযুত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে দেশীয় শিল্প কারখানায় উৎপাদন নয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস বেগবান করা সময়ের অনিবার্য দাবি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞর।

#

২৮.০৯.২০২০ পিআইডি ফিচার